ছড়ানো মুক্তা

কেন আমি সালাফি হয়েছিলাম, কেনইবা আবার হানাফি হলাম

SHAWON MUHAMMAD SHAHRIAR

2016-05-22 00:13:59 +0600 +0600

27 MIN READ

আমার জন্ম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। সম্পদের প্রাচুর্য বা দারিদ্র — কোনোটিই আমি সেখানে দেখিনি। দেখিনি 'আধুনিকতা' বা 'ধার্মিকতা' নিয়ে কোনো বিশেষ 'আগ্রহ' বা 'বাড়াবাড়ি'| আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবার তখন যেমন হতো ঠিক তেমন। একেবারেই সাদামাটা। স্কুলে যাওয়া, বাসায় পড়াশোনা করা, বিকেল বেলায় বন্ধুদের সাথে বাইরে খেলা, সুযোগ পেলে টিভি দেখা, আরেকটু বড় হলে পত্রিকা বা গল্পের বই পড়া — এগুলোই ছিল আমার নৈমিত্তিক রুটিন। আমার ধারণা, মফস্বল শহরে বেড়ে ওঠা আমার সমবয়সী অনেক ছেলের শৈশব আর কৈশোরটা এভাবেই কেটেছে।

ও, হুজুরের কথা বলতে তো ভুলেই গিয়েছিলাম! প্রতিদিন আমাদের বাসায় হুজুর আসতেন আমাকে আরবি পড়া শেখাতে। প্রথমে 'কায়েদা', এরপরে 'আমপারা', সবশেষে কুরআন – এতটুকুই। প্রতিদিন আধা ঘন্টার মতো কাটাতাম হুজুরের সাথে। তখনকার দিনে এটাই ছিল চল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এই সুযোগটুকুও পায় কি না জানি না। হুজুরের কাছে আরবি শেখার বাইরে আমাদের পরিবারে ধর্মচর্চার স্থান ছিল গৌণ – করলে ভালো, না করলেও তেমন কোনো ক্ষতি নেই – অনেকটা এরকম। পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমিও বিশেষ ব্যতিক্রম কিছু ছিলাম না।

তবে ব্যতিক্রম ছিল রমযান মাস, শুক্রবার, কুরবানি, মিলাদ এগুলো। রমযান মাসে প্রতি ওয়াক্তের নামায সময়মতো পড়া হোক আর না হোক প্রায় সবগুলো রোযাই রাখা হতো। তারাবীর নামাযও নিয়মিত পড়া হতো। কেউ রোযা রাখতে না চাইলে তার জন্য কোনো রকম জবরদস্তি অবশ্য ছিল না। রমযান শেষে ঈদের চাঁদ উঠলে অবস্থা আবার তথৈবচ – মসজিদ থেকে আযান ভেসে আসে, এদিকে যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে। জুমু'আর নামায বাদ দিলে পরিবারে নামাযের চর্চা ছিল না বললেই চলে।

সেখান থেকেই আমার পতনের শুরু। আস্তে আস্তে জুমু'আর নামায ছুটে যেতে শুরু করল। পরে একটা পর্যায়ে গিয়ে এমন হলো যে, মাসের পর মাস ধরে জুমু'আর নামাযও পড়া হতো না। এটা নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথা ছিল বলেও মনে হয় না। এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইসলামের চর্চা থেকে আমি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। চর্চা না থাকার ফলে ছোটবেলায় মুখস্ত করা সূরা আর দু'আগুলো একের পর এক ভুলে যেতে লাগলাম। সেই সময়টাতে আমি যে নাস্তিক বা সংশয়বাদী হয়ে গিয়েছিলাম তা নয়, তবে ধর্ম জিনিসটা তখন আমার কাছে তেমন বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখত না। একটি মুসলিম পরিবারে জন্মেও মানুষ ইসলাম থেকে কতটা দূরে সরে যেতে পারে এটি তার একটি বাস্তব উদাহরণ।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে ...

রাত যখন সবচেয়ে গভীর হয়, চারিদিক যখন নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে আসে, যখন কুকুর আর শিয়ালের ডাক ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শোনা যায় না — তার ঠিক পরেই আসে ভোর। রমযান মাসগুলোর বদৌলতে এই অন্ধকার বছরগুলোতেও আমার মধ্যে ঈমানের আলো নিভু নিভু করে হলেও জ্বলছিল। তা না হলে হয়ত তাও নিভে যেত।

আমার জীবনে নতুন ভোরের বারতা হয়ে আসে ২০০২ সালের রমযান মাসটি। তখন আমি ঢাকার মগবাজারে থাকতাম। মগবাজার চৌরাস্তা জামে মসজিদের খতিব সাহেব প্রতিদিন তারাবীর নামাযের শেষে প্রায় এক ঘন্টা ধরে ওই দিন তারাবীতে যা তিলাওয়াত করা হয়েছে তার একটি ধারণা দিতেন। তখন থেকেই প্রথম কুরআনের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মাতে শুরু করে। একইসাথে, ইসলামের প্রতি আমার টানটা আবার একটু একটু করে ফিরে আসতে শুরু করে। পুরোদস্তুর 'প্র্যাক্টিসিং মুসলিম' হয়ে না উঠলেও ওই সময়ে এটুকুও ছিল অনেক। খতিব সাহেব হয়ত জানেনও না যে, তাঁর চমৎকার কিছু কথার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলাম থেকে প্রায় বিচ্যুত একজন মানুষকে আবার ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছেন।

নতুন ভোর, নতুন আশা ...

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে, কী ছিল সেই ঘটনা যার ফলে আমি আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করলাম? বিশেষ করে যারা আমাকে আগে থেকে চিনতেন তাদের কারও কারও মধ্যে এই কৌতুহলটুকুএখনো থেকে থাকতে পারে। আসলে এই প্রশ্নের কোনো সরল উত্তর আমার কাছে নেই। ওই সময়টাতে আমার জীবনে এমন কোনো 'সেনসেশনাল' ঘটনা ঘটেনি যে, তার প্রতিক্রিয়ায় আমাকে পাল্টে যেতে হবে। শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি বর্ষিত এক বিশেষ অনুগ্রহ।

সম্ভবত ২০০৩ সালের রমযান মাসের পরের কথা। ঈদের কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পরে আমার মনে হলো যে, নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযটুকুঅন্তত পড়া দরকার। তখন থেকেই আমার নিয়মিতভাবে নামায পড়ার চেষ্টার শুরু। সামগ্রিক লাইফস্টাইলে তেমন একটা পরিবর্তন না আসলেও এটুকুও বা কম কিসে! অন্তত শুরুটা তো করা গেল।

এদিকে, মিডিয়ার জগতে তখন কিছু ছোট কিন্তু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। দেশ-বিদেশের বেশ কয়েকটা টিভি চ্যানেল প্রতিদিন আধাঘন্টার মতো ইসলামি অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ রাখা আরম্ভ করেছে। এখান থেকেই ডা: জাকির নায়েক-এর লেকচারের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। একেবারে শুরুর ওই দিনগুলোতে এবং পরবর্তী বছরগুলোতেও জাকির নায়েক আমাকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। ইসলামই যে একমাত্র সঠিক জীবনদর্শন এই ব্যাপারটি আমার মধ্যে বদ্ধমূল করতে তাঁর লেকচারের অবদান অনস্বীকার্য। পাশাপাশি, এনটিভিতে প্রচারিত 'আপনার জিজ্ঞাসা' অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উত্তরগুলোও দৈনন্দিন জীবনে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

যাত্রার শুরুতে ...

আমি তখন জীবনের একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। একদিকে ইসলাম সম্পর্কেজানার ব্যাপক আগ্রহ, অন্যদিকে পথ দেখানোর লোকের বড়ই অভাব। আমার মতো যারা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সরাসরি দাওয়াহ ছাড়া নিজে থেকেই ইসলামের পথে চলতে শুরু করেছেন তাদের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছি, আবার উঠে পথ চলতে শুরু করেছি।

শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের শুরুতে ইসলামের চর্চার সাথে তেমন একটা সম্পর্কনা থাকলেও বিভিন্ন মাযহাব এবং তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য সম্পর্কেআমার কিছুটা হলেও ধারণা ছিল। ইসলাম সম্পর্কেনতুন করে পড়াশোনা করতে গিয়ে ধারণাটি আরো পাকাপোক্ত হলো। কার কথা রাখি, আর কার কথাই বা ফেলি! তখন আমি কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম – কুরআন আর হাদিস নিজে ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগে পর্যন্ত অন্য কোনো ইসলামি বই আমি পড়ব না। শুরু হলো আমার নতুন পথ চলা। মুফতি মুহাম্মদ শাফি উসমানি রচিত 'তাফসির মা'আরিফুল কুর'আন'-এর বাংলা অনুবাদ এবং মুহসিন খান অনুদিত 'সহিহ আল-বুখারি'-র ইংরেজি অনুবাদ পড়া শুরু করলাম। দু'টি বইই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে আমার সময় লেগেছিল দুই বছরের কিছু বেশি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, 'সহিহ আল-বুখারি'-র নয়টি খন্ডের মধ্যে অষ্টম খন্ডের দিকে এসে আমি হাদিসগুলো কিছু কিছু বুঝতে শুরু করি। পাশাপাশি, পাকিস্তানের কিউটিভিতে প্রতিদিন রাতে প্রচারিত উর্দু ভাষায় ডা: ইসরার আহমেদ-এর করা তাফসিরের প্রায় প্রতিটি পর্বই আমি দেখার চেষ্টা করেছি।

কুরআন বা হাদিস বোঝার চেষ্টা তো চলতে থাকল, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে চলতে হলে আরো অনেক কিছুই তো জানা চাই। কারণ কুরআন বা হাদিস থেকে সরাসরি সব সমস্যার সমাধান বের করার জ্ঞান আমার তো তখনো হয়ে ওঠেনি! অগত্যা ভরসা ইন্টারনেট।

মাযহাবেই আস্থা ...

কুরআন যদি একই হয়, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেই যদি সবাই রাসুল মানেন, তাহলে কেন এত মতপার্থক্য? অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আমি এই রহস্যের সমাধান খুঁজতে লাগলাম।

মূলত দু'টি বিপরীতধর্মী কিন্তু শক্তিশালী যুক্তি আমি খুঁজে পেলাম। একটি যুক্তি হলো, কুরআন এবং 'সহিহ হাদিস'-এ যা আছে তাই হুবহু মানতে হবে, এর বাইরে যাওয়া মানেই হলো পথভ্রষ্টতা। দ্বিতীয় যুক্তিটি হলো, কুরআন বা হাদিস সরাসরি বুঝে তা থেকে আদেশ-নিষেধ বের করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নেই, ফলে হিজরি প্রথম তিন শতাব্দীর প্রাজ্ঞ পন্ডিতেরা কুরআন এবং হাদিসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা মানাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের জীবনটাকে সহজ করার জন্য যেকোনো একজন ইমামের মাযহাব বা মত মানাটাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় মতটিই আমার কাছে বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হলো কয়েকটি কারণে। প্রথমত, ওই সমস্ত ইমামরা, যাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে তাঁরা তাবেয়ী এবং তাঁদের পরবর্তী কয়েকটি প্রজন্মের মানুষ ছিলেন, ফলে তাঁদের জ্ঞানের ভিত্তি ছিল অনেক শক্ত। দ্বিতীয়ত, মেডিকেল কলেজে ভর্তি না হয়ে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে শুধুমাত্র ভলিউমের পর ভলিউম ডাক্তারি বই পড়ে যেমন কেউ ডাক্তার হতে পারে না তেমনি কোনো উস্তাদের কাছ থেকে সরাসরি না শিখে শুধুমাত্র বই পড়ে কেউ ইসলামি জ্ঞান সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। তৃতীয়ত, কোন মতটি সঠিক সেটি নিয়ে অপ্রয়োজনে সময় নষ্ট না করে সহজেই আমাদের সমস্যার সমাধানটি জেনে ফেলা যায়।

আমাদের দেশে যেহেতু হানাফি মাযহাব বহুলভাবে প্রচলিত তাই আমি হানাফি মাযহাবের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। মুফতি ইবরাহিম দেসাই-এর ফতোয়া ওয়েবসাইট এবং দেওবন্দি মতবাদের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত আরেকটি ওয়েবসাইট হয়ে উঠল আমার রেফারেন্স পয়েন্ট।

আস্থায় চিড় ...

যদিও আমি হানাফি মাযহাব অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম, তবে অন্য মাযহাবের অনুসারীদের ওয়েবসাইটগুলোতেও মাঝেমধ্যে ঢু মারতাম। কৌতুহলের বশে সেখানে ঘাটাঘাটি করলেও এক পর্যায়ে কিছু বিষয় আমাকে ভাবাতে শুরু করল। মাযহাবগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ মাযহাবের সবগুলো মতই কি বৈধ?

একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী কেউ যদি তার স্ত্রীকে স্পর্শ করে তবে তার উযু নষ্ট হয়ে যাবে, হানাফি মাযহাব অনুযায়ী তার উযু নষ্ট হবে না। একেবারেই বিপরীতধর্মী দু'টি মত। ইংরেজিতে যাকে বলে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। একইসঙ্গে দু'টি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ জিনিস সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে যুক্তির দাবী হলো এই দু'টি মতের একটি সঠিক হলে অপরটি অবশ্যই ভুল।

আমি আবারও লেগে পড়লাম একটি যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করতে।

গন্তব্য সালাফি দাওয়াহ ...

আগের দফায় আমি কুরআন ও 'সহিহ হাদিস' থেকে সরাসরি আদেশ-নিষেধ বের করার মতটার চাইতে কোনো একটি বিশেষ মাযহাব মানার মতটাকেই বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু এতদিনে আস্থায় যে চিড় ধরতে শুরু করেছে! এমনই এক সময়ে আমি শায়খ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল-আলবানি রচিত 'রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামায' বইটির বাংলা অনুবাদ পড়তে শুরু করলাম। এই বইয়ের শুরুতে তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ হুবহু অনুসরণের এবং সকল মতের উর্ধে 'সহিহ হাদিস'-কে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে যে যুক্তিসমূহ তুলে ধরেন তা আমাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। এতদিন ধরে এই কথাগুলোই তো খুজছিলাম! কথাগুলো পড়ার পরে ভিতর থেকেই আমার মন সায় দিলো।

ইন্টারনেটে আরো ঘাটাঘাটি করে জানতে পারলাম যে, আল-আলবানি যে যুক্তিগুলো ওখানে তুলে ধরেছেন তা সালাফি দাওয়াহ নামে পরিচিত।

এখন আমি যেকোনো প্রশ্নের উত্তরের সাথে কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্স মিলিয়ে দেখতে শুরু করলাম। শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-মুনাজ্জিদ-এর ফতোয়া ওয়েবসাইটে আগে মাঝেমধ্যে ভিজিট করলেও এখন ভিজিটের হার বাড়তে থাকল। সময়ের আবর্তনে কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে এই ওয়েবসাইটটিই হয়ে উঠল আমার মূল রেফারেন্স পয়েন্ট। মুখে কখনো দাবী না করলেও বাস্তবে আমি হয়ে উঠলাম সালাফি মতাদর্শের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী।

অন্তরের অন্দরে প্রাণের আনাগোনা ...

সম্ভবত ২০০৯ সালের দিকে আমি ইমাম সুহাইব ওয়েব-এর প্রতিষ্ঠিত ব্লগ সাইটের সাথে প্রথম পরিচিত হই। সেখানকার বেশ কয়েকটা লেখা পড়ে আমি ধীরে ধীরে, মনের অজান্তেই, ব্লগ সাইটটির সাথে ভালোবাসার সম্পর্কেজড়িয়ে পড়ি। এতদিন ধরে ইসলাম নিয়ে কত কিছু পড়েছি, কিন্তু এত প্রাণবন্ত লেখা তো কোথাও পড়িনি! আমাদের চারপাশের, নৈমিত্তিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া বাস্তব উদাহরণ দিয়ে যে ইসলামকে বোঝা যায় তা তো আগে জানতাম না! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে যে এভাবে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা যায়, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের নশ্বরতা আর আখিরাতের জীবনের অবিনশ্বরতাকে যে এভাবে উপলব্ধি করা যায় তা তো আগে কখনো এভাবে ভাবিনি।

আসলে এতদিন ধরে আমি যা পড়েছি তাতে কেন জানি একরকম স্পিরিচুয়াল ভয়েড বা আধ্যাত্মিক শূন্যতা ছিল। এই ব্লগ সাইটটির বেশিরভাগ লেখা, বিশেষ করে ইয়াসমিন মুজাহিদ বা জিনান ইউসেফ-এর লেখাগুলো আমার মধ্যেকার সেই স্পিরিচুয়াল ভয়েড কিছুটা হলেও পূরণ করতে অনেক সাহায্য করেছে।

নতুন সম্ভাবনার হাতছানি ...

২০১১ সালে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি। এতদিন ধরে যেসব স্কলারের ইসলামিক লেকচার দেখতাম পিস টিভি আর ইউটিউবে, এখন ঢাকায় বসেই সেই মানের শিক্ষকদের কাছ থেকে সরাসরি ইসলাম শেখা যাবে! শায়খ তৌফিক চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত আল-কাউসার ইন্সটিটিউট তখন সবে বাংলাদেশে এসেছে। আমাদের মতো দেশে আন্তর্জাতিক মানের এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের আসাটা আমার মতো মানুষের জন্য এক দুর্লভ সৌভাগ্যই বটে।

আল-কাউসার ইন্সটিটিউটে আমার প্রথম কোর্সটি ছিল 'লর্ডঅফ দ্য ওয়ার্ল্ডস', যেখানে দুই দিন ধরে শায়খ তৌফিক চৌধুরী আমাদেরকে তাওহিদ আল-রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহ সম্পর্কেবিশদ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই কোর্সটি থেকে আমি যা শিখেছি তার একটি সারসংক্ষেপ পরবর্তী মাসগুলোতে অন্য একটি ব্লগ সাইটে একটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করেছিলাম। তবে শুধুমাত্র তাওহিদ নয়, এই কোর্স থেকে আমি আরো অনেক কিছুই শিখেছি। কোর্সের প্রথম দিনেই শায়খ তৌফিক চৌধুরী সরাসরি শিক্ষকের কাছ থেকে ইসলাম শেখার গুরুত্ব এবং শুধুমাত্র ইন্টারনেট থেকে, বিশেষ করে ফতোয়া ওয়েবসাইট থেকে, ইসলাম শেখার বিপদ সম্পর্কেআমাদেরকে উপদেশ দিলেন। তার মানে, এতদিন ধরে আমি যেভাবে ইসলাম শিখে এসেছি তা পদ্ধতিগতভাবে সঠিক ছিল না!

মনের মধ্যে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড় ...

২০১১ সালের শেষের দিক থেকে শুরু করে ২০১২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয় আমার সামনে আস্তে আস্তে পরিস্কার হতে শুরু করে। এর মধ্যে আমার ভাবনার জগতে সবচাইতে বেশি নাড়া দিয়েছে উস্তায বিলাল ইসমাইল-এর নেওয়া আলকাউসার কোর্স, আসিফ সিবগাত ভূঞা নামের এক উদীয়মান উস্তাযের সাপ্তাহিক হালাকা এবং এক প্রিয় সহকর্মীর

সাথে দিনের পর দিন ধরে এই বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনামূলক আলোচনা।

প্রথমেই আসি উস্তায বিলাল ইসমাইলের কথায়, যিনি ২০১২ সালের প্রথম দিকটায় ঢাকাতে এসেছিলেন 'দ্য ফাইনাল রাইটস' কোর্সটি আমাদেরকে পড়াতে। জানাযা, দাফন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি নিয়ে পড়ানোর কথা থাকলেও তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আরো অনেক অনেক বেশি। কোর্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় পড়াতে গিয়ে তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন মতসমূহের প্রতিটি মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি মতই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এবং উসুলের খুঁটিনাটি ভিন্নতা স্বত্বেও প্রতিটি মতের উৎসেই আছে কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ।

এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলছি। প্রশ্ন হলো, দূরবর্তী কোনো ভূখন্ডে যদি কেউ মারা যায় তবে তার মৃতদেহের অনুপস্থিতিতে তার জন্য জানাযার নামায আদায় করা আমাদের জন্য বৈধ হবে কি? এই বিষয়ে ইসলামের আলিমদের মধ্যে চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। প্রথম মত অনুযায়ী, মৃতদেহের অনুপস্থিতিতেও দূরবর্তী স্থানে তার জন্য জানাযার নামায আদায় করা বৈধ, যেহেতু রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবিসিনিয়ার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নাজ্জাশির মৃত্যুর পর আবিসিনিয়া থেকে অনেক দূরবর্তী স্থান মদিনাতে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেছিলেন। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, মৃতদেহের অনুপস্থিতিতে দূরবর্তী স্থানে তার জন্য জানাযার নামায আদায় করা বৈধ নয়, কারণ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটি জীবনে মাত্র একবারই করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীরা প্রায় ষাটটির মতো সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে অনেক সাহাবী শহীদও হয়েছিলেন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই তাদের জন্য মদিনাতে জানাযার নামায আদায় করেননি। এই মতের অনুসারীদের মতে মৃতদেহের অনুপস্থিতিতেও জানাযার নামায আদায় করা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য বিশেষভাবে বৈধ ছিল, কিন্তু তাঁর উম্মতের জন্য নয়। তৃতীয় মত অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তি যেখানে মারা গিয়েছেন সেখানে তার জানাযার নামায না হয়ে থাকলে তবেই কেবলমাত্র তার অনুপস্থিতিতে দূরবর্তী স্থানে তার জন্য জানাযার নামায আদায় করা বৈধ। এই মতের অনুসারীদের মতে নাজ্জাশির মৃত্যুর পর আবিসিনিয়াতে তার জানাযার নামায আদায় করা হয়নি যেহেতু তিনি তাঁর ঈমান গোপন রেখেছিলেন এবং তাঁর সভাসদেরা ছিলেন খ্রিস্টান, ফলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনাতে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেছেন। চতুর্থ মত অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তি যদি গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকেন এবং তাঁর মৃত্যুর ফলে উম্মাহর মধ্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি অনুভূত হয় তবেই কেবল যেকোনো দূরবর্তী স্থানে তাঁর জন্য জানাযার নামায আদায় করা বৈধ। এই মতের অনুসারীদের মতে নাজ্জাশি মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি ছিলেন বলেই তাঁর মৃতদেহের অনুপস্থিতিতেও রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনাতে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন জিহাদে শহীদ হওয়া সাহাবাদের জন্য মদিনাতে জানাযার নামায আদায় করেননি।

একের পর এক এরকম অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে উস্তায বিলাল ইসমাইল আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি মাযহাবই শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মাযহাবের মূল উৎস হলো কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ। ফলে, কোনো বিষয়ে আলিমদের একটি মাত্র মতকে 'সহিহ হাদিস'-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মত বলে দাবী করে অন্য বৈধ মতগুলোকে অস্বীকার করা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে মাযহাবগুলোর প্রতি আরোপিত একটি বড় অপবাদ এবং গত প্রায় এগার-বারো শতাব্দী ধরে ধারণ করা আলিমদের সামষ্টিক পান্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের শামিল।

উস্তায বিলাল ইসমাইলের এই কথাগুলোর প্রতিধ্বনি আমি আবারও পাচ্ছিলাম প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে, ইমাম আন-নাওয়ায়ি-এর বিখ্যাত চল্লিশটি হাদিসের সংকলনের ওপর অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক হালাকাতে। এই হালাকার উস্তায আসিফ সিবগাত ভূঞা আরবি ভাষাতে পারদর্শী হওয়ায় একেকটি হাদিসের ব্যাখ্যা যে কতটা গভীর হতে পারে তা আমাদের খানিকটা জানার সুযোগ হয়েছে। আমাদের উস্তায মূল আরবিতে লিখিত হাদিসগুলোর বিস্তারিত পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা পড়ে এসে সেটাই আমাদের সামনে বাংলাতে উপস্থাপন করতেন। ইসলামিক স্কলাররা কতভাবে যে একটি হাদিস নিয়ে গবেষণা করেন এবং কিভাবে ছোট্ট কয়েকটি বাক্য

থেকে পাতার পর পাতা শিক্ষণীয় বিষয় বের করে আনেন তা দেখলে এমনিতেই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। অন্তরকে নরম করার জন্য, আল্লাহর আনুগত্যে লেগে থাকার জন্য, এমনকি সাধারণভাবে জানার জন্যও কুরআন বা হাদিস পড়লে তো ঠিকই আছে, বরং পড়তে তো হবেই, তবে সেখান থেকে সরাসরি আদেশ বা নিষেধ বের করার মতো জ্ঞান আমার মতো সাধারণ মানুষের নেই। আর একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত সঠিক তা বের করার যোগ্যতা তো নেইই।

বুঝতেই পারছেন, আমি আনুমানিক ২০০৪ সাল থেকে যাকে একমাত্র ধ্রুব সত্য বলে জেনে এবং মেনে এসেছি তা প্রায় আট বছর পর ২০১২ সালে এসে একের পর এক ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। তবে, আমি অন্ধভাবে কারো মত মেনে নেওয়ার মতো মানুষ নই। এর আগেও আমি বেশ কয়েকবার এরকম উথালপাথাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি, তবে আগেরগুলোর সাথে এবারেররটার পার্থক্য হলো এখন আমি সরাসরি রক্তমাংসের মানুষের কাছ থেকে শিখছি, ইন্টারনেট নামক ভার্চুয়াল কোনো জগৎ থেকে নয়। এই দফায় আরেকটি বড় পার্থক্য ছিল – আগে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার মতো কেউ ছিল না, কিন্তু এবারে ছিল। আমার এক সহকর্মীও এই টপিকের ওপর বেশ আগ্রহী ছিলেন। প্রথমদিকে বেশ কিছু বিষয়ে তাঁর সাথে আমার মতের অমিল থাকায় বেশ সুবিধাই হয়েছে। আমি আমার দিক থেকে যুক্তি দিতাম, তিনি দিতেন তাঁর দিক থেকে – এভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে যুক্তি আর পাল্টা যুক্তি এবং গঠণমূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা উভয়েই একটি উপসংহারে পৌঁছার চেষ্টা করে গেলাম। অন্তত আমি আমার উপসংহারটুকু খুঁজতে থাকলাম।

জীবনে অনাকাঙ্খিত নতুন বাঁক ...

এরই মধ্যে আমার আপাত স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনে ছন্দপতন ঘটল। একটি বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ এল। অনেক চিন্তাভাবনা করে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা নেওয়ার জন্য কথাবার্তা চলল। সুযোগ হলো মালয়েশিয়াতে চলে আসার।

২০১৩ সালে এখানে আসার আগে অনেক আশা ছিল। আসার পরে আশাভঙ্গ তো কিছুটা হয়েছেই। আবার, এখানে আসার পর আমি এমন অনেক কিছুই শিখেছি যা বই পড়ে শেখা যায় না। গত কয়েক বছরে জীবন সম্পর্কেআমার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পাল্টেছে। মালয়েশিয়াতে আসার পর ইসলাম সম্পর্কেআমার ধারণাও বেশ পরিণত হয়েছে।

নানান মত ও নানান পথ সামনাসামনি দেখার সুযোগ ...

যখন দেশে ছিলাম তখন একটা কথা প্রায়ই শুনতাম, আর তা হলো 'উপমহাদেশীয় বিদআত'। সালাফি বা আহলে হাদিস ঘরানার ভাইয়েরা এই কথাটি প্রায়ই বলে থাকেন। আযানের আগে দরুদ পড়া একটি 'উপমহাদেশীয় বিদআত'। নামাযের শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা একটি 'উপমহাদেশীয় বিদআত'। প্রতি জুমু'আর রাতে সূরা ইয়াসিন পড়া একটি 'উপমহাদেশীয় বিদআত'। মিলাদুন্নবী পালন করা একটি 'উপমহাদেশীয় বিদআত'। মিলাদ পড়া একটি 'উপমহাদেশীয় বিদআত'। ইত্যাদি, ইত্যাদি। মালয়েশিয়া ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো অংশ নয়। পারস্যের 'সুফিদের' হাত দিয়ে নয়, বরং আরব বণিকদের হাত দিয়েই এখানে ইসলামের আলো পৌঁছেছে। এতদিন ধরে যেসব কাজকে 'উপমহাদেশীয় বিদআত' বলে জেনে এসেছি তার অনেক কিছুই এখানে এসেও দেখলাম। দিনেদিনে 'উপমহাদেশীয় বিদআত' কথাটির অসারতা আমি বুঝতে শুরু করলাম। এই তথাকথিত 'উপমহাদেশীয় বিদআতগুলো' পারস্য থেকে নয়, বরং সরাসরি আরব থেকেই যে এসেছে তা আর আমার বুঝতে বাকী রইল না। পড়াশোনা করে আমি জানতে পারলাম যে, আলিমদের মধ্যে বিদআতের একাধিক সংজ্ঞা আছে। ফলে, একটি সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ বিদআত বলে গণ্য হলেও আরেকটি সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজটি পুরোপুরি বৈধ হতে পারে। সংজ্ঞাজনিত ভিন্নতা থেকে উদ্ভুত মতপার্থক্যের কারণে কোনো একটি মতের অনুসারীদের পথভ্রষ্ট বলে ঢালাওভাবে তকমা দেওয়া একটি ন্যায়ভ্রষ্ট কাজ ছাড়া আর কিই বা হতে পারে?

এখানে এসে দীর্ঘদিন ধরে অনেক আরবকে কাছে থেকে দেখার সুযোগও হলো। এদের বেশিরভাগই এসেছেন ইয়েমেন, লিবিয়া

বা ইরাক থেকে। নাইজেরিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে আসা মানুষদের সাথেও পরিচিত হলাম। এদের প্রত্যেকের দীনি আমল আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। স্থানীয় মালয়দের মতো এদের অনেকেই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। অনেকে মালিকি মাযহাবও অনুসরণ করছেন। হাতে গোনা কিছু সালাফিও আছেন। পাকিস্তান থেকে আসা হানাফিদেরও দেখলাম। গত কয়েক বছরে মুসলিম উম্মাহর বর্ণময় বৈচিত্র ছোট আকারে হলেও অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।

দীর্ঘদিনের পড়াশোনা ও পর্যবেক্ষণের পরিণতি ...

মালয়েশিয়াতে অনেকদিন ধরে থাকতে থাকতে আমি বুঝলাম যে, আমাদের বাঙালিদের মতো দ্বিধাবিভক্ত জাতি এই দুনিয়াতে হয়ত কমই আছে। বিদেশীদের আমরা যা করতে দেখি তার প্রায় সবই আমাদের ভালো লাগে। মক্কা ও মদিনার হারামের সম্মানিত ইমাম সাহেবরা সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর জোরে 'আমিন' বলেন, আমরা মনে করি যে সেটিই ঠিক। তাঁরা রুকুতে যাওয়ার আগে ও রুকু থেকে ওঠার সময়ে তাকবিরে তাহরিমার মতো আবারও দুই হাত উত্তোলন করেন, আমরা বলি যে ওটিই ঠিক। আমরা একটু তলিয়ে দেখি না যে, তাঁরা আসলে হাম্বলি মাযহাব অনুযায়ী আমল করছেন। আমাদের দেশের ইমাম সাহেবরা যেমন হানাফি মাযহাব অনুসারে নামায পড়ান, ঠিক একইভাবে সৌদি আরবের অধিকাংশ ইমাম সাহেব হাম্বলি মাযহাব মেনে নামায পরিচালনা করেন। আর এই হাম্বলি মাযহাব থেকে বিবর্তিত হয়েই সালাফি বা আহলে হাদিস মতবাদের উত্থান ঘটেছে। যারা মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান তাঁরা সেখানে মূলত হাম্বলি মাযহাবের উসুল বা মূলনীতির ভিত্তিতেই পড়াশোনা করেন।

আমি বুঝতে শুরু করলাম যে, হালে জনপ্রিয়তা পাওয়া সালাফি দাওয়াহ হাম্বলি মাযহাব দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। দুই শতাব্দীর কিছু বেশী সময় ধরে চালু থাকলেও এখন পর্যন্ত সালাফি আলিমরা তাঁদের নিজস্ব কোনো ফিকহি উসুল তৈরি করতে পারেননি। এরই পরিণতিতে সালাফিদের নিজেদের মধ্যেই ফিকহি বিষয়ে ঢের মতপার্থক্য দেখা যায়, যা মাযহাবগুলোর মধ্যকার মতপার্থক্যের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। একাধিক মতের মধ্যে কোনো একটিকেই যদি বেছে নিতে হয় তাহলে উসুলবিহীন অপেক্ষাকৃত নতুন কোনো মতবাদ অনুসরণ করার চাইতে সুনির্দিষ্ট উসুলের ভিত্তিতে গত প্রায় এগার-বারো শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত কোনো মতবাদের অনুসারী হওয়াই উত্তম।

সবদিক বিবেচনা করে আমি হাম্বলি মাযহাবের একজন অনুসারী হওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করলাম। এত বছর ধরে সালাফি থাকার সুবাদে আমি আগে থেকে যেসব মাসলা-মাসায়েল জানতাম তাতে খুব একটা পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হবে না বলেই আমার এই সিদ্ধান্ত। তাছাড়া, বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদিসগুলোর সাথে হাম্বলি মাযহাবের আমলসমূহ খুবই কাছাকাছি হওয়ায় মাযহাবটির প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা আমার আগে থেকেই ছিল।

অবশেষে ঘরে ফেরা ...

মানুষ ভাবে এক, কিন্তু হয় আরেক। আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো। আমার মাথায় কিছু চিন্তা তীব্রভাবে খেলা করতে শুরু করল। অধিকাংশ বাঙালির সাথে আমার নামায পড়ার কায়দা খানিকটা ভিন্ন হওয়ার কারণে সেই ২০০৪ সাল থেকেই পরিচিত ও অপরিচিত মানুষজনের কাছে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হতো। নামাযে নাভির নিচে হাত না বেঁধে আমি কেন বুকে হাত বাঁধি, আমি কেন জোরে 'আমিন' বলি, আমি কেন একাধিকবার 'রফায়ে ইয়াদাইন' করি ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ আমাকে প্রশ্ন করত। আমার মাথায় আসল যে, এগুলো তো কোনো ফরয বা ওয়াজিব পর্যায়ের আমল নয়। তাহলে এই অল্প কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে আমি কেন খামোখা আমার সময় নষ্ট করছি? আমার জান্নাত বা জাহান্নাম তো এসব খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। নামাযীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই আমি পেরেশান, বেনামাযীদের কাছে ইসলামের কথা বলার ফুরসত আমার কোথায়? ছোট আকারে হলেও, ইসলামের জন্য দীর্ঘমেয়াদে গঠনমূলক কোনো কাজ করতে হলে হয় আমাকে বাংলাদেশে কাজ করতে হবে, নতুবা বিদেশে থাকলে সেখানকার বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করতে হবে। এর অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে নেই বললেই চলে। তাহলে, সারা জীবন ধরে আমাকে বড়জোর সুন্নত,

মুস্তাহাব বা মুবাহ পর্যায়ের এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরই দিয়ে যেতে হবে? আর মানুষ আমাকে আপন না ভেবে পর ভেবে যেতে থাকবে? এভাবে চললে আমি কিছু মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে পারব ঠিকই, কিন্তু বৃহত্তর সমাজে আমাকে একজন 'আহলে হাদিস' হিসেবেই দেখা হবে এবং সেভাবেই আমার কথাকে প্রয়োজনে গ্রহণ বা বর্জন করা হবে। আমার সমস্ত সম্ভাবনাকে আমি কি এভাবেই নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলব?

আমি খেয়াল করে দেখলাম যে, সহিহ বুখারির সবচেয়ে বিখ্যাত টীকাগ্রন্থ ফাতহুল বারীর লেখক ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি একজন শাফেয়ী ছিলেন। আল্লামা আইনি ছিলেন একজন হানাফি। সহিহ মুসলিমের সবচেয়ে বিখ্যাত টীকাগ্রন্থের রচয়িতা ইমাম আন-নাওয়ায়ি ছিলেন একজন শাফেয়ী। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসগুলো তাঁরা আমাদের চেয়ে অধিকই বুঝতেন। এরপরেও একটি মাযহাব মানতে তাঁদের কোনো সমস্যা হয়নি। সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে অতীতের যাহিরি মতবাদ এবং গত মাত্র দুই শতাব্দীর কিছু বেশী সময় ধরে চলা 'সালাফি মানহাজ' ও 'আহলে হাদিস' মতবাদ বাদ দিলে গত প্রায় এগার-বারোশ' বছর ধরে মুসলিম উম্মাহর বাঘা বাঘা আলিমরা চারটি প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের মধ্যে একটিকে অনুসরণ করে এসেছেন। কোনো একটি মাযহাব মানলে যদি আসলেই 'মহাভারত অশুদ্ধ' হয়ে যেত তাহলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এত অধিক সংখ্যক আলিম জেনেবুঝে এমনটি করতেন না।

আমি দেখলাম যে, নিজেকে হাম্বলি বলে দাবী করলেও মানুষ আমাকে 'আহলে হাদিসের' খাতাতেই ফেলছে। সেটিই স্বাভাবিক, কেননা বাহ্যিকভাবে দেখলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। অতএব আমি নিজেকে হাম্বলি বলি আর সালাফি বলি না কেন, আগেকার সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমার পিছু ছাড়ছে না। তখন আমি ভেবে দেখলাম যে, হানাফি মাযহাবে আবার ফিরে গেলে কেমন হয়? হাম্বলি মাযহাবের মতো সেটিও তো বৈধ একটি মাযহাব, সেটির মূলনীতিও তো হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হানাফি মাযহাবে আবারও ফিরে গেলে আগেকার সেই প্রশ্নগুলো আমাকে আর তাড়া করে ফিরবে না, মানুষ আমাকে আর পর ভাববে না, বরং আমি মন খুলে দীনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে স্বাচ্ছন্দে কথা বলতে পারব।

সেই সময়ে, অর্থাৎ ২০১৪ সালের প্রথমার্ধে, আমি শায়খ ফারায রব্বানি প্রতিষ্ঠিত সিকার্স হাব-এ হানাফি মাযহাবের একেবারে মৌলিক আমলসমূহের ওপর একটি অনলাইন কোর্স করতে শুরু করলাম। একজন শিক্ষক হিসেবে শায়খ ফারায রব্বানি অসাধারণ। কোর্সটি করতে গিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিকার্স হাব-এর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা অসংখ্য প্রশ্নোত্তর মনোযোগ দিয়ে পড়ার মাধ্যমে অতীতে আমি সুন্নাহ বা 'সহিহ হাদিস' পরিপন্থী বলে মনে করতাম হানাফি মাযহাবের এমন অনেক মতের যৌক্তিকতা সম্পর্কেহানাফি মাযহাবের আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রথমবারের মতো বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরিচিত হলাম। কোর্সটি থেকে আমি আরো শিখলাম যে, মূলত উসুল বা মূলনীতির পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন মাযহাব বা মতবাদের খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েলে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উৎসগত দিক থেকে এই প্রতিটি মতই সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের শিক্ষা থেকে আহরিত। উৎস মোটামুটি একই হওয়া স্বত্বেও যেহেতু আলিমদের ওপর ওয়াহি নাযিল হয় না, তাই কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে তাঁদেরকে গবেষণা করতে হয়। দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন গবেষক ভিন্ন ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছতেই পারেন। এটিই স্বাভাবিক। এখানে হয়েছেও তাই। এখনও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণাগুলো এরকমই হয়ে থাকে।

জীবনে প্রথমবারের মতো হানাফি মাযহাবের প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মাল। অনেক বছর আগে আমি যখন হানাফি মাযহাবকে বেছে নিয়েছিলাম তখন আমার মধ্যে কোন মতটি সঠিক তা নিয়ে একটা খটকা সবসময় কাজ করত। এই খটকা থেকে উদ্ভুত কৌতুহলের কারণেই হানাফি মাযহাব পরিত্যাগ করে প্রায় আট বছরের জন্য আমি কট্টর সালাফি হয়ে গিয়েছিলাম। একটি মাযহাবের অনুসারী হওয়া স্বত্বেও সেই ২০০৩-০৪ সালের দিকে মাযহাবগুলোর প্রতি আমার পরিপূর্ণ আস্থা না থাকা পিছনে কারণ ছিল মূলত দু'টি। প্রথমত, মাযহাবী আলিমদের অনেকের তীব্র দলান্ধ আচরণ এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের 'দলিল' ও যুক্তি দিয়ে সুন্দরভাবে না বুঝিয়ে প্রচ্ছন্ন ঝাড়ির ভাষায় "এসব বোঝা তোমাদের কম্ম নয় বাছা, আমরা যা বলি কেবল তাই শোন" — অনেকটা এভাবে কথা বলা। দ্বিতীয়ত, হানাফি মাযহাবের উসুলের সাথে পরিচিত না থাকা। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের অনেকের কাছ থেকে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে হোক বা বাস্তব উপলব্ধি

থেকে হোক, যে কারণেই হোক না কেন, সবাই না হলেও মাযহাবি আলিমদের অনেকেই এখন ‘দলিল’ ও যুক্তি দিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় সুন্দরভাবে বুঝিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। সেই সময়ে এমন আলিমদের সম্পর্কেজানাশোনা থাকলে আমাকে হয়ত হানাফি মাযহাব থেকে ঝরে পড়তে হতো না।

প্রাসঙ্গিক বিধায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। প্রাচীনতম দু’টি মাযহাব, অর্থাৎ হানাফি ও মালিকি মাযহাব যথাক্রমে কুফা ও মদিনার তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীদের আমলের সবচেয়ে কাছাকাছি। অন্যভাবে বললে, সালাফদের কর্মগত আমল সবচেয়ে নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত আছে এই দু’টি মাযহাবের মধ্যে। অন্যদিকে, শাফেয়ী ও হাম্বলি মাযহাবে সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হাদিসের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথম ধারাটিকে আমরা যদি ‘দৃষ্টিনির্ভর’ বলে গণ্য করি তাহলে দ্বিতীয় ধারাটিকে ‘শ্রুতিনির্ভর’ বলা যেতে পারে। উভয় ধারার অনুসারীরাই কল্যাণের ওপর আছেন, ইনশাআল্লাহ। এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি আমি অতীতে অনুধাবন করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলাম। ইসলাম গ্রহণকারী ষষ্ঠ সাহাবী এবং আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রায় দুই দশকের খাদেম আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং কুফায় অবস্থানকারী অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবাদের কাছ থেকে সরাসরি ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করা তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীদের সম্মিলিত আমলের দালিলিক গুরুত্ব সহিহ সনদে বর্ণিত কিন্তু মুতাওয়াতির নয় এমন হাদিসের চাইতে কোনো অংশে কম তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশী। একজন বর্ণনাকারী যত নিখুঁত স্মরণশক্তির অধিকারী হোন না কেন, কোনো বক্তব্য বা ঘটনা হুবহু বর্ণনা করতে গিয়ে ছোটখাটো কিছু ভুল করে ফেলা অসম্ভব নয়, কিন্তু কুফার মতো শহরের সালাফদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক বুযুর্গ ব্যক্তি বড় কোনো ভুলের ওপর সবাই মিলে একমত হয়ে যাবেন এমনটি হওয়াটা অচিন্তনীয় বটে। বই পড়ে নয়, ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর প্রধান ছাত্ররা এসব বুযুর্গদের কাছ থেকে সরাসরি ইসলাম শিখেছেন এবং তারই ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত পেশ করেছেন। এই একটি বিষয় আমার মনের মধ্যে শক্তভাবে গেঁথে যাওয়ার পর থেকে হানাফি মাযহাবের উসুল নিয়ে আর কোনো খটকা বা সন্দেহ আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

শেষ কথা...

হানাফি, মালিকি, শাফেয়ী, হাম্বলি, যাহিরি, সালাফি বা আহলে হাদিস যাই বলি না কেন, এদের সবার মতেরই কিছু না কিছু ভিত্তি অবশ্যই আছে। আমি এদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একটিকে মানব। কিন্তু, সেইসাথে কেউ যদি আরেকটি মতের অনুসারী হন তাহলে তার প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল থাকব। জোর করে আমার মত আমি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেব না। আমার ‘দলিলের’ প্রতি আমার আস্থা থাকবে, কিন্তু অন্যের ‘দলিলকে’ আমি বাতিল বলে উড়িয়ে দেব না। এক মতের অনুসারী আলিমরা অন্য মতের অনুসারী আলিমদের সাথে বিতর্ককরতেই পারেন, তবে তা অবশ্যই হতে হবে সভ্য পন্থায়। আর আমরা যারা আম জনতা তাদের জন্য এসব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে বিতর্কেলিপ্ত হওয়া থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

আমরা যেন ভুলে না যাই যে, সালাফি বা হানাফি হওয়ার মধ্যে আমাদের পরকালীন মুক্তি নিহিত নয়। এগুলো ইসলাম পালন করার একেকটি পন্থা মাত্র। অতএব, কেবলই পন্থা নিয়ে পড়ে থেকে আমাদের চুড়ান্ত গন্তব্যকে ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের একেকজনের বেঁছে নেওয়া পন্থা যেটিই হোক না কেন, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ইসলামের ওপর বহাল থাকা এবং ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করতে পারাটাই হলো আমাদের সবার জন্য সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন।

*** *** ***

আরও পড়ুন:

- মাজহাবী-সালাফী দ্বন্দ্ব: উভয় পক্ষের পক্ষে ও বিপক্ষে যত কথা

- মাযহাবের ইমামদের কাছে হাদিসটি পৌঁছেনি!
- মাযহাবি-সালাফি বিবাদ
- সালাফদের প্রকৃত অনুসারী কারা? (অনুবাদ)
- কোন ধারাটি সর্বোত্তম? (অনুবাদ)
- প্রসঙ্গ: ফাতওয়া ওয়েবসাইট (অনুবাদ)
- ফিক্‌হি বিষয়ে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সহনশীলতা (অনুবাদ)
- ধর্মীয় মতপার্থক্যমূলক বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের পাঁচ গোল্ডেন রুল (অনুবাদ)